বস্তু থেকে বিষয়ঃ সমকালীন বিশ্বে 'আমি' সত্তার সিদ্ধিলাভের আখ্যান

আবীর চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকাঃ বিষয় সন্দর্ভের উৎপাদন

সাময়িকপত্র 'আনন্দন' পত্রিকার জুন, ২০১৯ সংখ্যায় বিশিষ্ট ভাষাবিদ পবিত্র সরকারের একটি লেখার সূত্র ধরে এই নিবন্ধটির সূচনা করার ইচ্ছে হলো। সুইস ভাষাবিদ ফার্দিনান্দ সস্যুর'এর ভাষাসংকেত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি (সরকার) বলছেন, "লিপি হলো ভাষার দৃশ্যরূপ। ভাষার শব্দগুলি এক হিসেবে প্রতীক 'গাছ'-এর গ+আ+ছ- তিনটি ধ্বনির কোনোটির সঙ্গে কথাটার কোনো অংশের সঙ্গে বা পুরো শব্দটির সঙ্গে 'গাছ' এই বস্তুটির কোনো সম্পর্ক নেই..."। অর্থাৎ যে কোনো ভাষাসংকেত নেহাতই আরবিট্রারি। সাধারণ জীবনে এই আরবিট্রারি শব্দটি'র অবশ্য দুটি ব্যবহার আছে। একটি হলো, সহজাত বা স্বতসিদ্ধ, আর একটি হলো কারুর ইচ্ছাধীন বা যথা ইচ্ছা। এই লেখারই শেষে তিনি বলছেন, লিপিতত্ত্বের পাশাপাশি সংকেততত্ত্বের ধারণা থাকা জরুরী। আমার প্রশ্ন হলো, কেন জরুরী? কারণ এ অনিবার্য। শুধু জীবনই নয়, আমাদের সমাজজীবনে হাজারো জীবনদর্শনের অস্তিত্বের ভিত্তিই হলো প্রথমত, বস্তু বা 'ম্যাটার' আর দ্বিতীয়ত, বানিয়ে তোলা বস্তু বা 'অবজেক্ট' সম্পর্কে চেনার, জানার, এবং সর্বোপরি বিশেষ উদ্দেশ্যে পুনর্ব্যবহার করার মতো 'বিষয়' সৃষ্টি করা। এইভাবে বিষয় সৃষ্টির পথে দরকার ভাষা-সংকেত (যার প্রাথমিক প্রকাশ্য চেহারা হলো লিপি) এবং তার অযুত নির্দিষ্ট, অনির্দিষ্ট অবয়ব যাকে আমরা 'কোড' বলি। আমরা যা কিছু দেখি, বলি, করি, সেগুলো আসলে এক একটি 'কোড' হিসেবে দেখি। ফলে আমাদের চারপাশে যা কিছু ছড়িয়ে রয়েছে তাকে চেনার একমাত্র রাস্তাই হলো সেই বস্তু বা মানুষ যে কোড'এ বিরাজ করছে তাকে চেনা। যেমন শিক্ষক, আমার শিক্ষক, আমার বাগানের গাছ, স্বার্থপর দৈত্যের বাগান, অভাবী, বিত্তবান ইত্যাদি। সমাজজীবন থেকে তুলে আনা একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আরও স্পষ্ট হবে। যেমন সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন অধ্যাপক'এর একটি পোষ্ট ছিল এই –

"নেচার কী এবং কালচার কী? ফিশ বা মাছ হলো নেচার এবং মানুষ বা মেন হলো কালচার..."।

এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক মন্তব্যের পরে এই লেখকও একটি মন্তব্য করে-

"নেচার কী তা কি আমরা আদৌ জানি? নেচার কী সেটা বুঝতে সংস্কৃতির প্রয়োজন লাগে তাই নয়, সেটাই সংস্কৃতি হয়ে ওঠে। যেমন, সমুদ্র, পাহাড়, জঙ্গল হলো প্রকৃতি একথা সবাই জানে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, জঙ্গলই কী সত্যি প্রকৃতি? জঙ্গল বলতে যাকে আমরা আসলে বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করি তাকে তো আমরা পার্ক বলি। তার গায়ে আবার 'জাতীয়' তকমাও জুড়ে দিয়ে থাকি। যেমন গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক"। আসলে প্রকৃতি'কে সামগ্রিকভাবে একটি কোড'এ ধরা সম্ভব নয়। ফলে নানারকমের খুচরো কোড দিয়ে আমরা আসলে কাজ চালিয়ে দিই। একথা বলাই বাহুল্য যে সেই কোড'গুলি আমাদেরই তৈরী করা। অতীতে এমন কোড যা তৈরী হয়েছে সেগুলিই 'ইতিহাস', আর এখন যা প্রতিদিন তৈরী হয়ে ব্যবহার হচ্ছে তাই দিয়েই 'বর্তমান' চেনা।

Society Language and Culture

কাজেই এই কোডসমূহকে চেনার, জানার সুত্র ধরে আমাদের জীবনদর্শনের যে অমোঘ উৎপাদন সত্য প্রকাশিত হয়, তা হলো, 'চার' সত্তার মহাসম্মিলনে সৃষ্ট "বস্তু-সংকেত-মানবমন"-এর মহাসম্পর্ক। এক, বস্তু; দুই, লিপি (সংকেত বা প্রতীক); তিন, ভাষা(কথা); চার, আত্মন এবং 'আমি'। এখন প্রশ্ন হলো, এই চার সত্তার বা অস্তিত্ত্বের সম্মিলন কি স্বভাবত, স্বাভাবিক, বা ন্যাচারাল? পবিত্র সরকার বা ফার্দিনান্দ দি সস্যুর, দুই বিশিষ্টের মত-ই হলো – সম্পর্ক না থাকলেও এ আরবিট্রারি অথবা এমনটাই হয়। অর্থাৎ এমনভাবেই সমাজে সৃষ্টি হয়েছে এবং চলে এসেছে। কিন্তু এভাবেও তো বলা যেতেই পারে যে, এ স্বতসিদ্ধ নয়, বানিয়ে তোলা? অর্থাৎ বানিয়ে তোলা সাম্রাজ্যের মতো বানিয়ে তোলা চেনা-জানার কৌশল? ঠিক যেমনটি রক্তকরবী'তে নন্দিনী আর অধ্যাপকের আলাপে ফুটে উঠল,

"অধ্যাপক। আমাদের মরা ধনের প্রেতের যেমন ভয়ংকর শক্তি, আমাদের মানুষ-ছাঁকা রাজারও তেমনি ভয়ংকর প্রতাপ।

নন্দিনী। এ সব তোমাদের বানিয়ে তোলা কথা।

অধ্যাপক। বানিয়ে তোলাই তো। উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে তোলা কাপড়েই কেউ বা রাজা, কেউ বা ভিখিরি..."।

নন্দিনী। তোমাদের খোদাইকর যেমন খনি খুদে খুদে মাটির মধ্যে তলিয়ে চলেছে, তুমিও তো তেমনি দিনরাত পুঁথির মধ্যে গর্ত খুঁড়েই চলেছ..."[১]।

ফলে বানিয়ে তোলা কথা/ভাষা'তেই আমরা যুগ যুগ ধরে এই জগত-সংসার প্রথমে চিনেছি, জেনেছি, তারপর সাজিয়ে নিয়েছি। চেনার প্রক্রিয়া, জানার প্রক্রিয়া থেকে সাজিয়ে নেবার প্রক্রিয়া আসলে চিরকাল আমাদের ইচ্ছাধীনই ছিল। তারপর যত দিন গেছে চেনার এবং জানার বিভিন্ন পঠন-পাঠন বিষয় সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু সাজিয়ে তোলার উদ্দেশ্যটি যথেষ্ট সমস্যার। ছোটো ছোটো নেটওয়ার্ক থেকে সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্র, জ্ঞানচর্চা সর্বত্র আসলে ক্ষমতার বানিয়ে তোলার কায়দাতেই কথা, ভাষা এমনকি লিপি'র সৃষ্টি হয়ে চলেছে।

স্বভাবতই এখন প্রশ্ন হলো, কার ইচ্ছাধীন বা কার বানিয়ে তোলা? আমি'র ইচ্ছাধীন, আমি'র বানিয়ে তোলা। কোন 'আমি'? যে আমি বাকিদের বলে, অর্থাৎ সাজিয়ে তোলা ভাষায়, জ্ঞাপন করে। কীভাবে বলে? মুখে বলে, লিখে বলে, বিজ্ঞপ্তি দেয়, আদেশনামা দেয় ইত্যাদি। কাকে জ্ঞাপন করে? কখনো কোনো বিশেষ 'আমি'কে, আবার কখনো অনির্দিষ্ট কোনো 'আমি'দের। তাহলে এই দুই 'আমি'র (একজন জ্ঞাপন করে, আর একজন নেয়) অবস্থান নিশ্চয়ই এক এবং অভিন্ন, এটা আশা করা যেতেই পারে? এইখানেই হলো 'ভাষা-সংকেত' বিজ্ঞানের আসল জটিলতা। 'জ্ঞাপক' আমি গ্রহীতা 'আমি'র সামাজিক বা সময়-পরিসরগত অবস্থান এক নয়, কোনোকালে কোনো ইতিহাসে ছিলও না। এই অসাম্যের ধারণা, বিশ্লেষণই হলো রাজনীতি বা রাজনৈতিক। জ্ঞাপক 'আমি' নিজেকে নিজেকে বিশিষ্ট প্রমাণ করতেই জ্ঞাপন করে এবং সৃজিত বা ধার করা বার্তার ভাষা-সংকেত নিজের 'ইচ্ছাধীন' করেই প্রকাশ করে। যেমন, 'আমার পড়ার ঘর' – এই কোড'এর মধ্যেও দুটি নির্দিষ্ট কোড বর্তমান। এক, 'আমি' বা 'আমার' এবং দুই, পড়ার ঘর। দুটিরই কিন্তু নির্দিষ্ট অবয়ব আছে এবং

Society Language and Culture

তারা মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ কোড তৈরী করেছে। কেন নির্দিষ্ট? কারণ, এর সাথে 'রবীন্দ্রনাথের পড়ার ঘর' – এর বিস্তর ফারাক রয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, কীসের ফারাক? এক, আমার এবং রবীন্দ্রনাথের ফারাক আর দুই, পড়ার ঘরের অবয়বের ফারাক। যদি "পড়ার ঘর" বিষয়টি মুখ্য হয়, তবে আমার ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যেকার তফাৎ গৌণ, আর যদি উল্টোটা হয়, তবে পড়ার ঘর গৌণ। একবার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এই লেখকের এমন একটি অভিজ্ঞতা হয়েছিল। লেখকের একটি বইএর ভাষা সম্পর্কে এক অধ্যাপক বলেছিলেন, 'তোমার লেখা পড়তে গিয়ে আমার কমল কুমারের (সাহিত্যিক কমল কুমার মজুমদার) ভাষা'র কথা মনে পড়ছিল (অর্থাৎ শক্ত অর্থে)'। একথা শুনে পাশে বসা আর এক অধ্যাপক বলেছিলেন, 'আরে কার সাথে কার তুলনা! একটু ভেবে বলুন। (এই লেখকের) কয়েকজন্ম লাগবে ঐ ভাষায় পৌঁছতে'। কিন্তু কয়েকজন্ম লাগবে ঠিক 'কোথায়' পৌঁছতে, তা আজও বুঝতে পারি নি। কাজেই দুটি মানুষের ভৌগোলিক তফাৎ'এর পাশাপাশি, আত্মনের তফাৎ, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা প্রভাবশালী 'আমি'দের দ্বারা সৃষ্ট যে 'কোড' (অর্থাৎ এখানে লেখক) তার 'আরবিট্রারি' ভাবই শেষ কথা।

তবু, বৃহত্তর সমাজ পরিসরে বহু আত্মনের ইচ্ছায় ইচ্ছিত (রবীন্দ্রনাথ- শান্তিনিকেতন) হয়ে এমন মহাসম্পর্কের সৃষ্টি, যা জ্ঞাপনকারী এবং গ্রহীতার সাংস্কৃতিক অসাম্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। কাজেই বস্তু, ভাষা-সংকেত এবং মননের এই সম্মিলন আমি'র আত্মন সন্দর্ভ থেকে উৎসারিত। আমি'র ইচ্ছায় এর জন্ম, বিকাশ, এমনকি নির্দেশিত বস্তুর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকলেও এরা অর্থাৎ ভাষা-লিপি বা সংকেত-বস্তু – এই তিন সত্তাই আমি'র ইচ্ছায় সম্পর্কিত এবং প্রতিষ্ঠিত। সস্যুর বলেছেন, এরা আরবিট্রারি, আর ফরাসী সংকেত মনস্তাত্ত্বিক জাঁক লাঁকা বলছেন, এরা আমি'র দ্বারা সৃষ্ট। যাঁরা লিপি দিয়ে দৃশ্যপট তৈরী করবেন, তাঁদের কথা আলাদা – কিন্তু যাঁর বা যাঁদের ইচ্ছে'তে ইতিমধ্যেই সেই "বস্তু-সংকেত-মানবমন"-এর দৃশ্যপট ঐতিহাসিকভাবে প্রতিষ্ঠিত সেই আমি-সত্তার আত্মন সন্দর্ভ সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। আমি কে, আমি কী করে, আমি কী বলে, কী আঁকে-লেখে, আর কেনই বা সেসব করে – এই মহাসম্পর্কের মহাসূত্রগুলির সন্ধান করা বিশেষ প্রয়োজন।

আমি কে? প্রভাবশালী, মধ্যজীবী, এবং সাধারণ

চারমূর্তি উপন্যাসে যেমন টেনিদা সহ চারমূর্তির পরিচয়পর্বের পর, '...অতএব নিশ্চিন্তে আড্ডা চলছে' – এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অতএব আসুন আড্ডা শুরু করি এই বলে, আমি কে? এই প্রশ্ন দিয়ে তবে 'আত্মন'এর অন্দরে যাত্রা শুরু হলো। কে এই যাত্রা আরম্ভ করলো? বলাই বাহুল্য শুধু এই অধম লেখকই নয়, যেখানে যত আছে সব আমি-তুমি-আমরা। কে এই আমরা? সহজ পাঠের মতো করে বলতে হয় আমরা 'অনেক'। 'আমরা' হলাম অনেক 'আমি'-র সম্মিলন। আমি, তুমি, সে, ওরা, আরও যাদের দেখা যাচ্ছে না - তারা সবাই মিলেও আমরা, আবার তাদের পৃথক করেও 'আমরা'। আমরা'র অন্দরে যেখানে যত সব আমি আছে তারা কেউ কখনো মিশে এক হয়ে যায়নি, বিভিন্ন শর্তে সময়বিশেষে মিলেমিশে আছে, পাশাপাশি আছে, সর্বোপরি বস্তু বা বস্তুগত হয়েও সবাই আদপে এক একটি 'বিষয়' হয়ে আছে। এই বিষয়গুলি এক একটি কাজে, মনে, এবং মননের নিরিখে এতটাই ব্যাপ্ত যে, এক লপ্তে ধরতে বা আন্দাজ পারা একটু মুশকিল বটে। তবু নির্দিষ্ট সমাজপটে বিশেষ প্রভাবশালী সংস্কৃতি একে নির্দিষ্ট অবয়বে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে ছেঁটে কেটে করে কেমন

Society Language and Culture

একটা 'কিম্ভুত' বানিয়ে তোলে। অতীত ইতিহাস থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত আমরা এই একই 'নাটক' দেখে চলেছি। তোষামোদের শংসাপত্রের মতোই প্রমুখ বা প্রবল আমি'র ইচ্ছাধীন প্রতিষ্ঠা-কে যথাসম্ভব স্বাভাবিক বলে আমরা'র মধ্যে প্রতিষ্ঠা করা আসলে মগজ ধোলাই করার হিড়িক। আবার এও ঠিক যে, আমরা কখনো তেমন একটি আমি'র আত্মন'এর অস্তিত্বকে আলাদা করে দেখতে পারি না, এ সব ক্ষেত্রে সাধারণত নিজের 'আমি'কে সযত্নে পাশে সরিয়ে রেখে, তারপর অন্যের সাথে যথাসম্ভব তুলনা করে তবে সেই 'আমি'কে চেনা শুরু করি। তবে কোনো কোনো বিশেষ ঘটনা বা মূহুর্তের মূল্যায়ন বা বিচার করে নিজের বা অন্যান্য 'আমি'কে চেনার বা ধারণা করার রেওয়াজটাও ঠিক-ভুল নির্বিশেষে বেশ প্রাচীন। তাই কখনো কোনো কোনো সময়-পরিসরে 'আমি'কে 'ওরা' থেকে একেবারে ভোগ্যবস্তু বা সংখ্যা দিয়ে বিচার করেও চেনার প্রয়াস করি। যেমন, সমাজে নারী'কে প্রাচীন, সমকালীন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ভোগ্যবস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতা চলে এসেছে, তেমনি সাধারণ মানুষকে একেবারে সংখ্যা দিয়ে সহজে বিচার সেরে ফেলার প্রবণতাও তো ইতিহাস থেকে সমকালে যথেষ্ট। এইভাবেই সুদূর অতীত ইতিহাস থেকে সম্প্রতিকাল পর্যন্ত বারবার আমাদের 'আমি'দের মিশিয়ে, দলা পাকিয়ে এক করে শুধুই 'সমগ্র' বানিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছে, আর ইতিহাসের পরম্পরায় যারাই এ কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছে, তারা কিন্তু সব বস্তু, সংখ্যার 'সমগ্র'কে ছাপিয়ে এক একটি বৃহৎ আমি'র অতিপ্রভাবশালী অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে। তাই দুর্বল, সবল যে কোনো 'আমি'র প্রতিষ্ঠা মোটেই আত্মন সন্দর্ভের স্বতস্ফুর্ত প্রকাশ বা বিচ্ছুরণ নয়, বরং হয় এক আদ্যন্ত সংক্ষিপ্তাকার 'আমি'র প্রবল আত্মপ্রকাশ, আর নচেৎ তস্য সাধারণ নিম্নবর্গীয় 'আমি'র অসহায় বা বিদ্রোহী প্রকাশ।

এতৎসত্ত্বেও বিভিন্ন সমাজপটে নানা উদ্দেশ্যে 'আমি'র দল মিলে আমি-তুমি'র মহাসম্মিলন রচনা করেছি, সংগঠন গড়ে তুলেছি অনেক লড়াই করে, কখনো অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধে, অতীতের সিংহাসন থেকে আজকের প্রভাবশালী থেকে মধ্যভোগী চেয়ার'এর বিরুদ্ধে, কখনো দমনকারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, কখনো বা মাথার উপরে চেপে বসা আচার, প্রথা, এবং তদনুযায়ী গজিয়ে ওঠা কাল্ট'এর (স্বঘোষিত ধর্মগুরু থেকে ফ্যাসিস্ট পর্যন্ত) বিরুদ্ধে, ফলে কখনো সেই সংগঠনেরই বিরুদ্ধে, আর সবশেষে সমাজ-পরিসর'টারই আমূল পরিবর্তনের জন্য। কিন্তু প্রত্যেকক্ষেত্রেই শেষরক্ষা হয় নি। একটা নির্দিষ্ট সময় পরেই নতুন পরিবর্তিত 'আমি' প্রবল চেহারা নিয়ে পুঞ্জে পুঞ্জে আত্মপ্রকাশ করেছে এমনকি সমাজ, গোষ্ঠীর বাইরেও প্রভাবশালী 'আমি'র সঙ্গে মিলিত হয়ে শক্তিপুঞ্জ সৃষ্টি করে চলেছে শাসন করবে ব'লে।

ফলে ওইসব প্রভাবশালী 'আমি'দের অস্তিত্বের বিপরীতে এই সাধারণ 'আমি' এবং আমি'র অস্তিত্ব ও সক্রিয়তাকে বিশেষভাবে জানা দরকার। সর্বাগ্রে আমি আসলে 'কে', এই আখ্যান ভালোভাবে গড়ে তোলা দরকার তবেই আত্মন সন্দর্ভ'এর স্বরূপ উদ্ঘাটন হতে পারে। সভ্যতার বিকাশের আদিসময় থেকেই 'আমি' গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ভাবনায়, কর্মে, আবার সমাজপটে বিভিন্ন ঘটনার পরিণতি হিসেবে, এমনকি অস্তিত্বের বহু ভাষায়, বহু সত্তায় এবং বহু সংস্কৃতিতে। সেই সব ভাবনার অবয়ব এবং অবয়বের ভাবনা থেকে কখনো সমগ্রতায় আবার কখনো ব্যক্তিসত্তায় জানতে হয়েছে আমি 'কে' 'কী' ভাবি, 'কী' বলি এবং সর্বোপরি 'কেন' ভাবি, 'কেন' বলি, আর 'কেন'ই বা কিছু করি।

Society Language and Culture

যে কথা বলে তাই শুরু করতে হয় যে, আমি-তুমি-আমরা সমগ্র প্রকৃতির জীবকূলের এক একটি পংক্তি। এই পংক্তির মধ্যেই আরও নানা পরিচয়ে ছড়িয়ে আছে অনেক কালজয়ী ভাবনা, চিন্তার ফসল। তাদের কথা উল্লেখ করতে হবে, আলোচনাকে সমৃদ্ধ করতে হবে। তো, প্রশ্নটা হলো সর্বপ্রথম কী করে জানলাম, যে আমরা মানুষ? এই জ্ঞানের বৈজ্ঞানিক সত্য বলে কিছু হয় না, বরং বৈজ্ঞানিক বা লব্ধ জ্ঞানের একটি পরিচয় দিতে হয়। যা দেওয়া হয়েছে তা হলো মানুষ। এই তথাকথিত সাধারণ জানার পথ ধরে যা কিছু অসাধারণ তাকে জানার ইচ্ছে'টাকে সম্বল করে তবেই না 'জ্ঞান-কথপোকথন-আদানপ্রদান-জ্ঞাপন' অর্থাৎ আমি'র 'সক্রিয়তা'র আসল যাত্রা শুরু।

আত্মন-সন্দর্ভ থেকে উৎসারিত আমিঃ অদ্বৈত না বিভাজিত?

সেই পরম্পরায় পঞ্চদশ শতকে ইউরোপীয় প্রাথমিক বুদ্ধিবিভাসা'র দার্শনিক রেনে দেকার্তে আত্মন'এর আধুনিক অভিপ্রায় নিয়ে বললেন,

'আমি মনে করি তাই আমি আছি' (I think therefore I am)।[২]

অর্থাৎ তিনি যেন সেই একই ভঙ্গিতে বললেন, আমি শুরু হয় 'ভাবনা' দিয়ে, আর সেই ভাবনাই নিশ্চিত করে যে 'আমি' আছি। এই ভাবে একদিকে আমি-র জৈবিক অবস্থানকে যেমন জীবজগতের অন্যান্য প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে দিলেন তেমনি অন্যদিকে প্রতিষ্ঠা করলেন সচেতনতা বা consciousness-এর নিরিখেই তার স্বাতন্ত্র্য, তার দ্বিতীয় পরিচয়।

জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট প্রায় একইরকম দ্বৈত অবস্থানে মানুষকে ব্যাখ্যা করলেন,

"মানুষের অস্তিত্বগত জ্ঞান দুটি শ্রেণিতে স্বতন্ত্র; এক, শারীরিক এবং দুই, সচেতনতা (pragmatic)। প্রথম জ্ঞান হলো, প্রকৃতি মানুষকে কিভাবে তৈরি করে; আর দ্বিতীয় জ্ঞান হলো, মানুষ তার সক্ষমতা দিয়ে কিভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে। অর্থাৎ একদিকে আমি যেমন pure, আর একদিকে তেমনি empirical' বা ঘটনার অভিজ্ঞতাপ্রসূত"[৩]।

আর এক জার্মান দার্শনিক লুডউইগ ফয়ারবাখ মানব-সত্তা নিরূপণে যাবতীয় অধি-তত্বের বিপরীতে অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে বলছেন,

"মানুষ আসলে আমি আর তুমি-র মধ্যে বিভাজিত"[৪]।

কাজেই আমাদের অবস্থানের এক নিশ্চিত সমগ্রতার মধ্যে বাস করতে করতে আমরা মানুষের দল 'আমি'র প্রমুখ জ্ঞানের উপরে আরও কয়েক পরতের 'বিতরণযোগ্য' জ্ঞানের বিকাশ ঘটিয়েছি। সেই বিতরণযোগ্য অথবা আদানপ্রদানযোগ্য জ্ঞানগুলিকে আমরা 'মনুষ্যত্ব' বা 'মানবিকতার' বিভিন্ন প্রকাশ বলে চিহ্নিত করে থাকি।

তাহলে এই দাঁড়াল যে, মানুষ যে আত্মজ্ঞান ও সচেতনতার মাধ্যমে তার চরিত্রের সামগ্রিক প্রকাশ ঘটায় তাই-ই তার মনুষ্যত্ব যা ব্যক্তিত্বে প্রকাশ পায়। আমরা তাই 'মনুষ্যত্ব কোড' দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বলি, 'আমাদের

Society Language and Culture

মনুষ্যত্ব আছে তাই আমরা মানুষ', যদিও সাধারণভাবে সঠিক মনুষ্যত্ব বলতে ঠিক কী বোঝায় তা নিয়ে আমাদের ধারণা বহুত্বে ভরা। গোটা মনুষ্যত্ব বিষয়টাকে আমরা তাই সুবিধামতো ভালো ও খারাপের সহজ দ্বিত্বের মধ্যে টেনে এনে ফেলেছি। এ যেন এক কর্মফল, যার দ্বারা আমাদের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। যেমন প্রাতিষ্ঠানিক প্রশ্নের 'ভালো' তালিকার কাজকে আমরা মনুষ্যত্বের উচ্চ-অধিকারের মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছি। আবার সেটাই আমরা ছড়িয়ে দেওয়া বা শেখানোর দায় যেমন নিয়েছি তেমনি সেই দায়ের প্রতিদান বা স্বীকৃতিস্বরূপ সেই একই সমাজজীবনে অন্যান্য মানুষেরই উপর নিজেদের অধিকারের বিস্তৃতিও ঘটিয়েছি যথেষ্ট। এই অধিকারবোধ এবং তার ভাষা প্রাচীনে ব্রাহ্মণ্যবাদের 'ক্ষমতা' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজন্যবাদ, ধনবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজবাদ হয়ে আজ রাজনীতিবাদ, ভোগবাদ এবং সর্বোপরি ব্যক্তিবাদের ক্ষমতায় এসে ঠেকেছে। তাই বোঝাই যাচ্ছে যে, ভালো-খারাপ-এর দ্বিত্বের বাইরে আমরা প্রাতিষ্ঠানিকতার জ্ঞান প্রকাশ করেই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করি। শুধু তাই নয়, এহেন মনুষ্যত্বের নানাবিধ প্রকাশ দিয়ে আমরা একদিকে যেমন নিজেদের ব্যক্তি-পরিচয় গড়ে তুলি অন্যদিকে সেই পরিচয়-কে 'আদর্শের' নামে নতুনরকমের শিক্ষার আধিপত্য বিস্তারও করে থাকি।

আবার 'পরিচয়' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমি'র সমগ্রতার মধ্যেও দেকার্তে, কান্ট, হেগেল-এর ভাবনার অনুসরণে মানবসত্তার সেই দ্বৈত পরিচয়-'কে' দুটি প্রত্যক্ষ পর্যায়ে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ একদিকে প্রমুখ পরিচয় আর একদিকে কর্মপটে বা সমাজপটে তার গড়ে তোলা 'স্বাতন্ত্র্য' অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে 'আমি কে' এই কথাটিকে স্বাধীনভাবে উপলব্ধি করা।

"আমাদের পরিচয়ের একটা ভাগ আছে যাহা একেবারে পাকা - আমার ইচ্ছা অনুসারে যাহার কোনো নড়চড় হইবার জো নাই। তাহার আর-একটা ভাগ আছে যাহা আমার স্ব-উপার্জিত, আমার বিদ্যা ব্যবহার ব্যবসায় বিশ্বাস অনুসারে যাহা আমি বিশেষ করিয়া লাভ করি এবং যাহার পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব নহে। যেমন মানুষের প্রকৃতি; তাহার একটা দিক আছে যাহা মানুষের চিরন্তন, সেইটেই তাহার ভিত্তি - সেইখানে সে উদ্ভিদ, পশুর সঙ্গে স্বতন্ত্র, কিন্তু তাহার প্রকৃতির আর-একটা দিক আছে যেখানে আপনাকে আপনি বিশেষভাবে গড়িয়া তুলিতে পারে - সেইখানেই একজন মানুষের সঙ্গে আর-একজন মানুষের স্বাতন্ত্র্য"[৫]। (পরিচয়। আত্মপরিচয়)।

আবার দার্শনিক কার্ল মার্কস সাধারণ জীবনসমূহের শ্রম অভিজ্ঞতার এক সামগ্রিক অবয়ব সৃষ্টি করে বলছেন,

"মানুষের পরিচয় তার শ্রমকর্মের বিষয় এবং তার ফলের পরিণতির উপর নির্ভর করে। মানুষের পরিচয় তার ব্যক্তিসত্তার কোনো বিমূর্ত ধারণার মধ্যে নেই, তা রয়েছে তার সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে"[৬]।

তাই মানুষ হয়ে ওঠার সংগ্রামটি যেমন একরকমের সৃষ্টি, তেমনি আসল মানুষ হয়ে ওঠা এবং খুঁজে পাওয়ার লড়াইটাও তো কম দীর্ঘ নয়। গ্রীক দার্শনিক ডায়োজিনিস-এর মতো মানুষ খুঁজে বেড়ানোর লড়াইটাও তো সেই শৃঙ্খলা ভাঙারই লড়াই। আবার জার্মান দার্শনিক ফ্রীডরীশ নীৎসে মানুষের সত্তাপরিচয়কে 'কারণ-ফল' (reason-effect) এর পরস্পর বিপরীত প্রশ্নে না বিচার করে একে একদিকে সমাজের বিশেষ ক্ষমতাবল

Society Language and Culture

এবং অন্যদিকে তার প্রতি আকর্ষণ অথবা বিকর্ষণের মধ্যেকার এক চিরন্তন খেলা হিসেবে দেখেছেন। তিনি মানুষের পরিচয় প্রসঙ্গে গ্রীক পুরাণের উদাহরণ দিয়ে বলছেন,

"মানুষ দুরকমের। একজন সুশৃঙ্খলার দেবী এপোলো-র মতো, আর একজন ঝড়ের, বিশৃঙ্খলার, উন্মাদনার দেবতা ডায়োনিসের মতো"[৭]।

এই প্রসঙ্গে 'গোড়ায় গলদ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও যেন কতকটা প্রমুখ কারণ নির্ভর হয়েই বলছেন,

"মানুষ কি চোখ চাইলেই দেখা যায়! দৈবাৎ হাতে ঠেকে"।

যেন তিনি ডায়োনিসীয় মানুষটিকেই খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাই রক্তকরবী-তে যক্ষপুরীর শৃঙ্খলার ধ্বজার উপরে বিশৃঙ্খলার খেলায় মেতে ওঠার নায়ক রঞ্জন-'কে' ঠিক সেভাবেই খুঁজেছেন যখন নন্দিনী বলছে,

"নন্দিনী- দুই হাতে দুই দাঁড় ধরে সে আমাকে তুফানের নদী পার করে দেয়; বুনো ঘোড়ার কেশর ধরে আমাকে বনের ভিতর দিয়ে ছুটিয়ে নিয়ে যায়; লাফ দেওয়া বাঘের দুই ভুরুর মাঝখানে তীর মেরে সে আমার ভয়কে উড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসে। আমাদের নাগাই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্রোতটাকে যেমন সে তোলপাড় করে, আমাকে নিয়ে তেমনি সে তোলপাড় করতে থাকে। প্রাণ নিয়ে সর্বস্ব পণ করে সে হারজিতের খেলা খেলে। সেই খেলাতেই আমাকে সে জিতে নিয়েছে..."[৮]।

তাহলে কে এই রঞ্জন? অথবা রঞ্জন-এর মধ্যে যে 'আমি'কে রবীন্দ্রনাথ এঁকেছেন তার নাগাল পাওয়া কঠিন হলেও এর অবয়বটিকে জানা অত্যন্ত জরুরি। এখানে 'মুক্তির প্রতীক' জাতীয় অতি-সরলীকৃত বিশেষণ প্রয়োগ করে শ্রেণি প্রতিনিধি এবং তা রবীন্দ্রনাথেরই অভিপ্রায় বলে চালিয়ে দেওয়া গেলেও এভাবে রঞ্জন-কে খুঁজে পাওয়া কিন্তু একটু মুশকিল বটে। আসলে রক্তকরবী নাটকে রঞ্জন চরিত্রটির তো কোনো সক্রিয় ভূমিকা নেই, উপস্থিতি-র জোরালো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা নেই, যা রয়েছে সে শুধু তার আমি'র পরিচয়ে। সেইখানেই দেখতে হবে সে 'কে'। মুক্তি-র প্রতীক বিশেষণটি আমাদেরই দেওয়া হলেও সেটাই রবীন্দ্রনাথেরই মুখ্য উদ্দেশ্য বলে আবিষ্কার করে এসেছি। কিন্তু এই প্রতীকের নেপথ্যে কি কোনো পৃথক 'আমি' লুকিয়ে নেই যাকে স্বাভাবিক সামাজিকতার মধ্যেও উপলব্ধি করা যায়? রঞ্জন নন্দিনী-র কাছে আর রাজার কাছে যেভাবে প্রতিষ্ঠিত সেটাই তার অবয়বের পরিসীমা। রঞ্জনের আমি-কে সেভাবে চেনাই তো সঠিক। সেটাই প্রকৃত বস্তুবাদী ভাবনা এবং রবীন্দ্র ভাবনা।

যেমন নন্দিনীর মুখে,

"আমার রঞ্জনের জোর তোমাদের শঙ্খিনী নদীর মতো। ঐ নদীর মতো সে যেমন হাসতেও পারে তেমনি ভাঙতেও পারে"।

আবার, রাজার বর্ণনায় -

Society Language and Culture

'আমি জানি রঞ্জনের সঙ্গে আমার তফাতটা কী। আমার মধ্যে কেবল জোরই আছে, রঞ্জনের মধ্যে আছে জাদু'[৯]।

যদি এই প্রসঙ্গে সমকালীনতা এবং আমাদের অবস্থানের তুলনামূলক বিচার করি তাহলে কোনো পরিস্থিতিতেই 'জাদু' কথাটির নাগাল পাওয়ার মতো সামাজিক অনুশীলন, জীবনচর্যা, জ্ঞানচর্চা আমাদের গড়ে ওঠে নি। গত সত্তর বছরের আমাদের স্বাধীন জীবনচর্যার পথে আমরা 'জোর' দিয়েই সামাজিকতা প্রতিষ্ঠা করেছি আর সেই 'জোর'এর অধীনেই নিজেদের যেমন তেমন করে বসিয়ে নিয়েছি, ইংরেজিতে যাকে কোনোরকমে 'অ্যাকোমোডেট' করা বলে। তাই যা রাজা'র কাছে 'জাদু', তা সর্দারের গলাতে যেন অজানার কৌতুহল,

'তোমার রঞ্জন যে ছুটি বয়ে নিয়ে বেড়ায় সেই ছুটিকে রক্তকরবীর মধু দিয়ে ভরে রাখে কে, আমি কি জানি নে...'।

সর্বোপরি রাজা, সর্দারের অধস্তন পংক্তি অর্থাৎ মোড়লের মুখে রঞ্জনের বর্ণনার দিকে নজর দিতেই হবে, কারণ সেখানে রঞ্জন একেবারেই অজানা-

'মানুষটার ভয়ডর বলে কিছুই নেই। গলায় একটু শাসনের সুর লেগেছে কি অমনি হো হো করে হেসে ওঠে। জিজ্ঞাসা করলে বলে, গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ, আমি তাই খসাতে এসেছি...ভাবলুম মানুষটা চাপে পড়ে বশ মানবে। উলটো হলো, খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের নাচিয়ে তুললে, বললে, আজ আমাদের খোদাইনৃত্য হবে...রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বললে, মাদল পাই কোথায়, ও বললে, মাদল না থাকে কোদাল আছে। তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিন্ড নিয়ে সে কি লোফালুফি...রঞ্জন বললে, কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে...'[১০]।

ফলে সমাজের ক্ষমতাকাঠামোয় উপর থেকে নীচ পর্যন্ত রঞ্জন ক্রমশ অজানা হয়ে উঠছে। কাজেই এই 'জাদুময়' বিশৃঙ্খলার 'আমি'কে আগাগোড়া জানতে হলে 'মুক্তির প্রতীক' বিশেষণ দিয়ে একে বেঁধে রেখে কি হবে? নাটকের ঘটনার পরিণতি তো আমরা সবাই জানি। সেই পরিণতি বা ফল অনুযায়ী চরিত্রের অবস্থানই কি আসলে প্রকৃত চরিত্র? তাহলে রবীন্দ্রনাথ রঞ্জন, পঞ্চকের অমন বর্ণনা দিলেন কেন? শুধুই কি নাটকের সৌন্দর্যের জন্য? আর বাকিটা শুধুই ফল বা অভিজ্ঞতানির্ভর? এমন ভাবনা কিন্তু 'আমি'র মুখ্য ভাবনা বা অর্থকটির নাগাল পেতে সাহায্য করবে না। এ কাজে রবীন্দ্রজীবনের অন্দরের মধ্যে আড়ি পাতবার দরকার নেই, যা লেখা আছে তার সবটুকুকে শুধু কাজের মধ্যে আনতে হবে। তাহলেই পাওয়া যেতে পারে সেই দারুণ 'আমি'র সন্ধান।

ফলে এক্ষেত্রে প্রভাবশালী সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে থেকে নয়, মানুষের ভাবনা থেকেই আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে বিচার করে বা বেছে নিতে হয় আমি আসলে 'কে', অথবা সে 'কে', তুমি 'কে' ইত্যাদি। তাই আমি আসলে সাংস্কৃতিক গড়ন বা অবয়ব যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত হয়। ঠিক তেমনি অচলায়তন নাটকে রবীন্দ্রনাথের দাদাঠাকুর-'কে', পঞ্চক-'কে' নির্মাণ করেছেন শিক্ষার অচলায়তনের বিপরীতে নতুনের প্রতীকে, যে বলছে,

Society Language and Culture

"পঞ্চকঃ ঢেউ তোলো ঠাকুর, ঢেউ তোলো, কূল ছাপিয়ে যেতে চাই। আমি তোমায় সত্যি বলছি আমার মন খেপেছে, কেবল জোর পাচ্ছি নে - তাই দাদাঠাকুর, মন কেবল তোমার কাছে আসতে চায় - তুমি জোর দাও - তুমি জোর দাও - তুমি আর দাঁড়াতে দিয়ো না..."[১১]।

অর্থাৎ প্রাচ্য-প্রতীচ্যের আমি-জ্ঞানের ধারায় 'আমি কে' এটা নিজেই একটা স্বাধীন ধারণা। আবার এই ধারণা থেকেই সামাজিক 'আমি'-কে আরও চিনতে শেখার শুরু। আর এই ধারণা থেকেই আমরা একদিকে যেমন চিরন্তন মানুষ এবং অন্যদিকে আরও বেশি সৃজনশীল কিছু একটা; বিশেষ থেকে কিংবদন্তী কিংবা কালজয়ী পর্যন্ত। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

"আমরা কেহ জর্মানির সম্রাটবংশে জন্মিয়াছি আবার কাহারও-বা এমন বংশে জন্ম - ইতিহাসের পাতায় সোনালি অক্ষরে বা কালো অক্ষরে যাহার উল্লেখমাত্র নাই। ইহাকে জন্মান্তরের কর্মফল বলিয়াও কথঞ্চিৎ সান্ত্বনালাভ করিতে পারি অথবা এ সম্বন্ধে কোনো গভীর তত্ত্বালোচনার চেষ্টা না করিয়া ইহাকে সহজে স্বীকার করিয়া গেলেও বিশেষ কোনো ক্ষতি নাই" (পরিচয়)[১২]।

এই জন্ম-পরিচয় থেকে সামাজিক প্রশ্নে ব্যক্তি-পরিচয় এবং ব্যক্তিত্বের প্রসারের প্রয়োজনে সর্বশেষে আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হয়েছে আমাদের নাম-ধাম-এর। অর্থাৎ এই বিশ্বে 'আমি-কে' এবং কিভাবে আছি এই পরিচয়ে। রবীন্দ্রনাথ 'সঞ্চয়' প্রবন্ধে বলছেন,

"আমি আছি, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা"[১৩]।

আবার নাম-ধাম ছাপিয়ে সৃষ্টি-র সেই 'আমি'-র ভাষা নিজের খুশিমতো স্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ রূপ পেল গীতবিতানের গানে,

"...এই যে আমি ওই আমি নই, আপন মাঝে আপনি যে রই,

যাই নে ভেসে মরণধারা বেয়ে -

মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি, শান্ত আমি, দৃপ্ত আমি,

ওরি মাঝে দেখছি আমি চেয়ে..."[১৪]। (যে আমি ওই ভেসে চলে)।

সমকালীন পরিচয় ও সমষ্টির 'আমি'

যাবতীয় দ্বন্দ্ব-বিরোধের শেষে এই 'আমি'-র সর্বশেষ বা সমকালীন পরিচয়টা বিশশতকের যুদ্ধবিদ্ধস্ত বিশ্ব কিংবা একুশ শতকের বিশ্বব্যাপী অতিবাণিজ্যিক 'রাজনৈতিক আলোকবৃত্তের' সমকালে এত সহজ নয় একথা বলাই বাহুল্য। এখন আমাদের পরিচয় বলতে যেন নিজের ব্যক্তিসত্তাকে সমষ্টি থেকে alienate বা বিচ্ছিন্ন করার মধ্যে দিয়ে নিজেকে এক বিশ্লেষকের নিরাপদ জায়গায় স্থাপন করাই মুখ্য উদ্দেশ্য। অর্থাৎ সেই

Society Language and Culture

জ্ঞাপনকারী 'আমি'-র শক্তিবৃদ্ধি আর বহনকারী বা গ্রহণকারী 'আমি আর তুমি'র চিরদাসত্বের সম্ভাবনা। এ এক খুবই জটিল সমস্যা।

একদিকে ধর্মীয় আচারসর্বস্বতা অন্যদিকে বিশ্লেষক ব্যক্তি'র নতুন নতুন বাণীসর্বস্বতার মধ্যে আসলে আমিসর্বস্বতা, এই দুইএর যুগল অবস্থানে এক অদ্ভুত আধিপত্যের জটিল সমীকরণ তৈরি হয়েছে। এই জটিলতার আবর্তে পড়ে সাধারণের যেমন স্বাধীনতা বলেই কিছু থাকছে না অন্যদিকে এক অদ্ভুত লুম্পেন-সংস্কৃতির সূচনা হচ্ছে যা এই নয়া আধিপত্যের সামাজিক প্রতিনিধিত্ব করছে। এই লুম্পেনতত্ত্ব শুধু মারদাঙ্গা-র মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রভাবশালীর মত প্রচারের দায়িত্বও যে তার কাঁধে। যা রবীন্দ্রনাথ ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে দেখেছিলেন তখন, আমরা আজ তা ধর্মীয়, রাজনৈতিক, দৈনন্দিন সর্বত্র দেখতে পাই এক অভূতপূর্ব সুবিধাবাদের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন,

"...হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে। এইজন্যই সে পরামর্শে সত্য ফল পাওয়া যায় না। কারণ, আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধটা তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই একলা তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি"। (পরিচয়)[১৫]।

কিন্তু পাশ না কাটিয়ে আসার মধ্যেও যে অবস্থানে 'আমি' পড়বো তাও যে নেহাতই আচারসর্বস্ব একটা কাঠামো যা আজও প্রাচীন ধর্মীয় রীতি-রেওয়াজের মৌলবাদে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাই এই আচারসর্বস্ব ধর্মীয় পরিচয়ের থেকে পরিত্রাণ না নিলেও উপায় নেই। সঙ্ঘ-আচারসর্বস্বতার বাইরে আমাদের যে পরিচয়টুকু অবশিষ্ট থাকে তা অতি সামান্য বলে ইতিমধ্যেই বিবেচিত হয়েছে। আর এই সামান্য 'চির-অপাঙতেয়' অবস্থান নিয়ে পড়ে থাকে সাধারণ মানুষ।

ঠিক যেমন, সমকালীন প্রেক্ষাপটে আমি অমুক রাজনৈতিক দল করি না, এই পরিচয়টি দিয়ে সমস্ত পরিচয় এবং যাবতীয় আলোচনার সূত্রপাত হচ্ছে। অর্থাৎ আমাকে নিরপেক্ষ অথবা নিদেনপক্ষে অমুক দলের সমর্থক নই বলে মেনে নিলে তবে আমি কিঞ্চিৎ পরামর্শ দিতে পারি। আর এই সুবিধাবাদটিকেও পূর্ণমাত্রায় ব্যবহার করে চলেছে আজকের গণমাধ্যম-বুর্জোয়াতন্ত্রের সম্মিলিত অবস্থান।

সাধারণতন্ত্র ও বুর্জোয়াতন্ত্রের সখ্য?

Society Language and Culture

এই পরিস্থিতিতে সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বুর্জোয়াতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব করাকে এবং তার সাথে সখ্য তৈরি করাকে যতটা সম্মানজনক বা সুবিধাজনক বলে মনে করা হয়, সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব করার পরিচয়টি ততটা স্বভাবতই আর আকর্ষনীয় থাকে না। তখন বুর্জোয়া, শ্রেণিপ্রভু যে আর আগের মতো অত্যাচারীটি নেই 'সরাচাপা হাঁড়ির তলায়' অনেকটাই সুবোধ হয়ে এসেছেন, এটা প্রমাণ করার দায়টাও সেই মানুষেরই ঘাড়ে এসে পড়ে। এই পর্যায়ে মানুষ এমন 'কোড' সম্পর্কে একেবারেই অচল, জড় কারণ সে এর বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানে না, এও জানে না যে সমষ্টিগত ভাবে তার আসলে কী করণীয়। তবু তারই ঘাড়ে ইতিহাস রচনার দায়ভার চাপিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু এই যাবতীয় কথার বাইরে মানুষের সমস্যাক্লিষ্ট জীবন এবং সেই জীবনের প্রতিনিধিত্ব করা, সেই রাজনীতিটার কি হবে? আমি কে? আমি যে প্রতিনিধি। আমি কাকে বলবো সে কথা? তোমাকে। কিন্তু এই 'তুমি' আসলে কে? এই 'তুমি'দের চিহ্নিত করার কাজটি ক্ষমতার কেন্দ্রগুলি অনেক আগে থেকেই যে করে বসে আছে। আবার যে 'মানুষ' আচারসর্বস্বতার প্রায় কিছুই না মেনে মন্দিরে ঠাকুরের উদ্দেশে একটু সাহচর্য প্রার্থনা করে, হাতজোড় করে প্রণাম করে, সে 'কে'? তার ঘাড়ে কি লুম্পেনতন্ত্র বা বুর্জোয়াতন্ত্র-কে উদ্ধার করে আমাকে ক্ষমতার কাছাকাছি বসিয়ে দেবার দায় বর্তায়? নাকি আবার স্বৈরাচারের পা জড়িয়ে চিরকাল ক্লীবের জীবন যাপন করাটাই তার ভবিতব্য? নাকি সে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রতীক? সে কে? এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সমাধানও আজ হয়তো অসম্পূর্ণ। তিনি পরিচয় প্রবন্ধে যখন বলছেন,

"অতএব আমি যাহা উচিত মনে করিতেছি তাহাই করিব, কিন্তু এ কথা কখনোই বলিব না যে সমাজের মধ্যে থাকিয়া কর্তব্যপালন চলিবে না। এ কথা জোর করিয়াই বলিব যাহা কর্তব্য তাহা সমস্ত সমাজেরই কর্তব্য। এই কথাই বলিব, হিন্দুসমাজের কর্তব্য আমিই পালন করিতেছি"[১৬]।

প্রান্তিক 'আমি'র আখ্যান

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও সে কে? আসলে, যেমনটি অধ্যাপক গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক[১৭] বলছেন, এই 'সে' হলো 'প্রান্তিক', ইংরেজিতে সে হলো other, যার 'আমি'র পরিচয় হয়তো পাওয়াই গেল না বা বোঝাই গেল না। আজ 'হিন্দুস্থান' নামক অবয়বটিও আমাদের সব ভারতবাসীকে আশ্রয় দিতে অপারগ হয়ে পড়ছে, নাহলে ধর্মীয় সম্প্রদায়গত কারণে, সামাজিকভাবে উচ্চ-নীচ শ্রেণি নির্বিশেষে সব অংশেই এত মৃত্যু, খুন ঘটবে কেন? যত মৃত্যু ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে, তার চেয়ে অনেক বেশি নতুন নতুন অর্থের ও ব্যাখ্যার দাবি উঠে আসছে এই ভাষাটির জন্যেও। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নানা অবিমৃশ্যকারী ভূমিকার এক অদ্ভুত বৈপরীত্যে উঠে আসছে হিন্দুস্থানের নানা পরিচয়ের দাবি এবং সেই সব দাবি সরাসরি রাজনৈতিক অনুমোদনে সিদ্ধ হচ্ছে প্রতিনিয়ত।

Society Language and Culture

কিন্তু এই সব অর্থাবয়বের সম্মিলিত যে মুখ্য অর্থক বা উদ্দেশ্যটি আজ ভারতবর্ষের হিন্দু-রাষ্ট্র হয়ে ওঠার পরিচয় হয়ে উঠছে তা আমাদের সাধারণের পরিচয় নয়, আমাদের পরিচয় নিহিত রয়েছে সমগ্র ভারতবাসীর সমষ্টি-র কোনো বিকল্প অর্থকে, যেখানে আমরা সবাই একদেশের মানুষ, এক ভাষাতেই 'মা' কে ডাকি। তার জন্য বরং 'হিন্দুস্থান' শব্দবন্ধটি বর্জন করতে হলে অন্তত ভারতবর্ষ বা ভারতবাসীর তেমন কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কারণ 'ভারতবর্ষ' বা আজকের 'ভারত' তো থাকল, এমনকি ইন্ডিয়াও থাকল। কোনো গানের মধ্যে উল্লেখিত শব্দ যে অর্থই বহন করুক না কেন, তা যেমন গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের পরিচয় হতে পারে না, তেমনি তথাকথিত বুর্জোয়াতন্ত্রের সাম্প্রতিক কোনো গণতান্ত্রিক পরিচয়েও তার কোনো অস্তিত্ব নেই, এমনকি তার কোনো রাজনৈতিক সখ্যের পরিচয়ও হতে পারে না। সম্প্রদায়ের বিরোধিতা নতুন কোনো সম্প্রদায়ের সৃষ্টি-র মধ্যে নেই, বরং প্রতিবাদস্বরূপ সেই সম্প্রদায়ের ভাঙার মধ্যে আছে। সেই ভাঙনের মধ্যে দিয়ে যদি স্বাধীনভাবে কোনো সমষ্টি-র সত্তা তৈরি হয় তো হবে। মানুষের কথার স্বাধীনতার মধ্যেও সমষ্টিভাব এবং সচেতনতা থাকে কারণ মানুষের 'আমি' কে স্বীকৃতি দিয়ে যে কোনো সমষ্টি সম্ভব।

তাহলে আমি কে?

কাজেই আজ পরিচয়ের একটা নতুন মাত্রা দরকার। এই ক্ষমতার শ্রেণি-অস্তিত্বের বাইরে আর কি কোনো শ্রেণি-সমষ্টি-র সম্ভাবনা নেই? নতুন শ্রেণি সচেতনতা অথবা প্রান্ত সচেতনতা? এই যে 'আমি'র মধ্যে 'মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি, শান্ত আমি ও দৃপ্ত আমি' - এই আমি কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে?

আর এই যে 'আমি'কে খুঁজতে রবীন্দ্রসৃষ্টি থেকে বিশ্বব্যাপী সত্যদর্শনের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করছি, তার কি হবে? সে কে, যে আজও খুঁজে চলেছে আমি-'কে'? এই আমি তো প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রের রসাস্বাদনের আমি নই, এ আমি সৃষ্টির 'আমি' যে পদকর্তার বাধ্য নই, এই আমি নিজেই সাজাই আমার সবকিছুকে। এই আমি বেদান্ত-উপনিষদের আমি নই, যাবতীয় প্রভাবশালী ভাবনার বিপরীতে আমার বাস। এই আমি জ্ঞাপন করি বটে তবে প্রভাবশালী জ্ঞাপনকর্তা আমি নই। সাধারণ মার্কিনী জ্ঞাপনতত্ত্বগুলিতে যে আমি-কে শুধু জ্ঞাপনকর্তা হিসেবে পরিচিতি দিতে গিয়ে আসলে ক্ষমতাশালীকেই প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয়েছে এই আমি সে নয়। আবার এই আমি'কে আপাত দুর্বল বিচার করে তার প্রতিনিধিত্ব করার দায় যাঁরা নিয়েছেন, এই আমি সে আমিও নই। এই আমি শুধুই এক আমি, যে স্বাধীন, কর্তৃত্বের বুলি আওড়ানো স্বাধীন নয়, আবার লুম্পেনের প্রতিনিধি হিসেবেও সে আমি নয়। এই আমি বৃহতের বিপরীতে আমি, যে কোনো ক্ষেত্রে, যে কোনো পদে, যে কোনো পরিসরে।

যে 'শ্রম' আমার পরিচয় হতে পারল না, সন্তুষ্ট করতে পারল না আমার পরিচালককে, আমার দাসত্ব-টাই তখন তার কাছে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এটাই তখন আমি'র পরিচয় হয়ে ওঠে। সে আমার ইচ্ছার শ্রম চায় না, আমার সক্রিয় অথচ অবনত উপস্থিতি চায়। আর যা নিয়ে নিতে চায় তা হলো আমার স্বাধীন প্রতিবাদের ইচ্ছা এবং ভাষাটি। তাঁর কাছে এই 'আমি' কে? কিছুদিনের জন্য প্রতিনিধিত্বের উপযুক্ত, বাকিটা আলোকবৃত্তের বাইরে। আর অপরদিকে টেলিভিশনের পর্দা থেকে গণমাধ্যমের অক্ষের বাইরে সাধারণের শ্রমের কি মর্যাদা, কি মূল্য তারই বা মূল্যায়ন হলো কই। 'আমি'র এই মাইক্রো বা ব্যক্তিস্তরে এবং ম্যাক্রো বা সমষ্টিস্তরের দুই

Society Language and Culture

প্রান্তকথা তো কোনো বিশেষ সময়ের দাসত্বের ফল নয়, যে তার 'অবনতির' সামগ্রিক কোনো উৎসারণ ঘটবে ফলে তার দাসত্ব মোচনেরও একটা পরিবর্তনকামী সম্ভাবনা তৈরি হবে। এই দাসত্ব কোনো বিশেষ অত্যাচারী বা বিশেষ পরিকল্পনা ছাড়াই সৃষ্টি হয় এবং তা পরম্পরাগতভাবে চলতেও থাকে।

তাই এই প্রসঙ্গে বলতেই হয় তাহলে সাধারণ, প্রান্তিক 'আমি' কি আদৌ স্বাধীন? আজকের গণমাধ্যম এবং ভারচুয়াল পরিসরের মায়াবিশ্বে প্রবেশ করার আগে আলোচনা করতেই হয় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক'এর কালজয়ী প্রবন্ধের কথা - 'নিম্নবর্গীয়েরা কি আদৌ কিছু বলতে পারে'? একে আর একটু বিশদে যা তিনি বলতে চেয়েছেন তা হলো, নিম্নবর্গীয়েরা কি তাদের নিজেদের কথা আদৌ নিজেরা বলতে পারে? কী কথা? আপন দাবির কথা, আপন বাঁচার কথা, নিজের জীবনের কথা। স্পিভাক বলছেন, সমাজপ্রভুরা তাদের হয়ে কথা বলে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু তাদের মনের কথা, উদ্দেশ্য, ইচ্ছে, দাবি সবই অনুচ্চারিত, অপ্রকাশিতই থাকে। এ প্রসঙ্গে স্পিভাক বলছেন,

"নিম্নবর্গীয়েরা কি আদৌ কিছু বলে? ধারাবাহিকভাবে নিম্নবর্গীয় বানিয়ে তোলার প্রশ্নে নজরদারি করতে এলিট'দের অবশ্যকর্তব্যগুলো কী? এ প্রসঙ্গে 'নারী' প্রশ্নটাই সবচেয়ে সমস্যার। যদি আপনি দরিদ্র, কৃষ্ণকায় বা নারী হন তাহলে বিষয়টি তিন রকমের। আবার যদি এই ধারণাটি প্রথম বিশ্ব থেকে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রসঙ্গে স্থানান্তরিত করা হয়, তাহলে কৃষ্ণকায় বা গায়ের রঙ বিষয়টি তার সক্রিয়তার তাৎপর্য হারায়...উপনিবেশগত প্রশ্নে বিষয়টিকে গুরুত্বই দেওয়া হয় নি...এই একই কাজ নারী সচেতনতা বিষয়টির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য...কালো মেয়েদের সাথে প্রথম বিশ্বের দেশে এবং অত্যাচারিত, শোষিত মেয়েদের সাথে তৃতীয় বিশ্বে একসঙ্গে কোনো সাধারণ কাজ করাটাই যেন একটা বিশেষ পরিকল্পিত বিষয়। এই বিষয়ে যে কোনো তথ্যই নৃতত্ব, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস এবং সমাজতত্বের বিষয় হয়ে ওঠে। তবু এই বিষয়ে সচেতনতা বা বিষয় হিসেবে একে গড়ে তোলার প্রশ্নে শিক্ষা এবং সভ্যতার অগ্রগতির সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়। ফলে নিম্নবর্গীয় নারী নিশ্চুপ হয়েই থেকে যায়"[১৮]।

অর্থাৎ স্পিভাক'এর মতে নিজেদের প্রয়োজনে 'নিম্নবর্গীয়' বানানোর প্রশ্নে বুর্জোয়া প্রতিনিধিতন্ত্রের কৌশলের ফলে শোষিত, অত্যাচারিত নারীরা যেন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে সমাজের মূলস্রোতেই যেন বিশেষ 'প্রতীক' হয়ে উঠেছে, তাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করাটাই যেন একটা বিশেষ ব্যাপার। অথচ তাদের সচেতন করে তোলার কোনো শিক্ষা উদ্যোগই গ্রহণ করা হয়নি। কারণ এ ব্যাপারে সাম্রাজ্যবাদী শিক্ষাপ্রক্রিয়ার উপর আমাদের যে দারুণ টান। ফলে নিম্নবর্গীয় নারী ব্যবহৃত হলো যথেচ্ছ কিন্তু তার আপন সচেতনতা, স্বাধীনতার বিষয়টি প্রায় অনুচ্চারিতই থেকে গেল। হারিয়ে গেল আসলে সেই আমি'টা কে? তারা আসলে কারা? প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্গীয় চিহ্নায়ন সাধারণ মানুষের পরিচয় নয়। তাদের মুখ্য ইচ্ছে, সত্তা বা অর্থকটাই অজানা থেকে গেল, কোনোভাবেই প্রকাশিত হলো না, জানা গেল না তাদের প্রকৃত 'আমি'রা কে? সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবীর প্রয়াণে সংবাদপত্রে যে লেখা প্রকাশিত হলো তাতে প্রান্তিক শবর গোষ্ঠী আবার যেন ব্যবহৃতই

Society Language and Culture

হলো বিষয়ের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য। অথচ আবার তাদের 'আমি'র কোনো সন্ধান করা হলো না, তারা ব্যবহার্য বস্তু হয়ে থেকে গেল। ফলে এ যেন নারী, নীচুজাত, আদিবাসী সবার ক্ষেত্রেই একইরকম প্রযোজ্য।

যাইহোক এইপর্যায়ে স্পিভাক তৃতীয় বিশ্বের নিম্নবর্গীয় মানুষের বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে একদিকে যেমন পশ্চিমী মেধামহলের সমালোচনা করেছেন তেমনি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন যে এই সামগ্রিক বিশ্লেষণের নেপথ্যে পশ্চিমী অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে। যে কোনো তৃতীয় বিশ্বের ভাবনাকেই পশ্চিমী বিষয়-গড়নের মোড়কে প্রতিষ্ঠা করার প্রশ্নেই যেন আর এক উপনিবেশের শর্ত লুকিয়ে আছে। এইভাবে তিনি সমগ্র পশ্চিমী শিক্ষা প্রচেষ্টাকেই সাম্রাজ্যবাদী বলেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু প্রবন্ধের শেষে নিম্নবর্গীয় নারীর আত্মজ্ঞান, মুখ্য ইচ্ছেটা এবং সামাজিক পরিসরকে যেভাবে হনন করা হয় তার বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে স্পিভাক[১৯] দেখাচ্ছেন কীভাবে নিম্নবর্গীয়ের 'আমি'কেই আসলে হনন করা হয়। তাই সেই তৃতীয় বিশ্বের 'আমি'কে খুঁজতে স্পিভাক প্রাচ্য দর্শনের অন্দরেও হেঁটেছেন। দেখিয়েছেন ধর্মশাস্ত্রে কীভাবে নারী অবস্থানটিকেই প্রান্তিক করে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ফলে 'সতী' প্রথার মতো বর্বরতার ব্যাখ্যাতেও একদিকে আত্মবলিদানের কোড প্রতিষ্ঠা হয়েছে অন্যদিকে কে সেই আত্মবলিদান করবে, এই প্রশ্নে নারীই হলো other বা প্রান্তিক, অর্থাৎ পুরুষ বা পিতৃতন্ত্রের অনুসারী। ভারতজুড়ে 'সতী' প্রথাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও সাধারণ মানুষের প্রান্তিকতা থেকে মুক্তির তেমন চেষ্টাই হয় নি। এরই মধ্যে বন্দী হয়ে আছে আমাদের 'আমি'র মুখ্য ইচ্ছেগুলো, বলার কথাগুলো। অথচ গণমাধ্যমের বিশ্বায়ন প্রতি মুহূর্তে আমাদের জানিয়ে চলেছে তার জনগণ নাকি প্রতিদিন কত বড় বড় আন্দোলনে সাফল্য পেয়ে চলেছে। অথচ আজও একটা নারীমৃত্যুকে প্রথমে ধর্ষণ'এর কারণ পেরিয়ে, সেই 'আমি'র আর কি কি পাপ কাজ আছে সেই সব সুশীল প্রশ্নস্তর পেরিয়ে তার যন্ত্রণা এবং মৃত্যু পর্যন্ত অনুভব করতে করতে লোকে ঘটনাটাই ভুলে যায়, কারণ ততদিনে গণমাধ্যমও তার পরিসর অন্য কাজে ব্যবহার করে ফেলে। তবু বলতে হবে প্রতিবাদ তো হয়েছে, কারণ আমি'র উপর অত্যাচারের প্রতিবাদ, আমি'র সামাজিক-অর্থনৈতিক উন্নয়ন তো নাগরিক অধিকারের বা দাবির মধ্যে পড়ে না। এইখানে 'আমি' সত্যিই প্রান্তিক।

আমি এবং সবার মোহের আমি

তবু একুশ শতকে আজ সামাজিক স্তরে এক অদ্ভুত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে গণমাধ্যম ও জ্ঞাপন প্রযুক্তির বিস্ফোরণের ফলে। এতক্ষন ধরে যে আমি-র ইচ্ছে, আমি-র ব্যক্তি ও সমষ্টি অবস্থান, এবং আমি-র ভাষার কথা সারা পৃথিবীর দার্শনিকদের বিশ্বাস, গবেষণা থেকে গ্রহণ করলাম, সেই ইচ্ছে, অবস্থান এবং ভাষা-র এক অভূতপূর্ব পরিমার্জন ঘটল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় থেকেই। এই পরিমার্জন শুধুমাত্র প্রযুক্তির দ্বারাই ঘটেছে তা নয়, প্রযুক্তির চালিকা শক্তি যে মেধা, ইচ্ছেশক্তিগুলি এতদিন ব্যক্তি আমি-র সন্ধান করে বেড়িয়েছে এবং তারই মধ্যে দিয়ে সমষ্টির স্বাতন্ত্র্যের বৈপ্লবিক ইতিহাস রচনা করেছে, সেই ইচ্ছের উৎসের কেন্দ্র অভিমুখের পরিবর্তন ঘটল। সামাজিক উৎসের বদলে ব্যক্তি, আমি-র ছড়িয়ে পড়ার ইচ্ছেগুলো কেন্দ্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠা পেল

Society Language and Culture

গণমাধ্যম প্রযোজিত উৎসের মধ্যে। এ ঘটনাটি আজ এতটাই ব্যাপ্ত যে সারা পৃথিবীজুড়ে সমাজব্যবস্থার সক্রিয়তাকে প্রতিস্থাপিত করেছে গণমাধ্যম প্রযোজিত কোড। 'আমি'র চেহারাটি এখন কেমন হবে? সোপ অপেরার কোনো চরিত্রের মতো হবে না কি খবরে যে মুখগুলি সবচেয়ে বেশি দেখা যায় তার ভাষাই আমি'র ভাষা হবে, অথবা চলতি সিনেমা'র নায়ক'রা পরস্পরকে যে 'ভাই' কোড চালু করেছে সেটাই কি 'আমি'র ভাষা? পরিধান কোড, মেকআপ কোড, চুলের স্টাইল, পড়ার কোর্স, প্রেমের ভাষা, সম্পর্কের সমীকরণ, এমনকি অত্যাচারীর শাস্তি পাওয়া সবই গণমাধ্যমের একচেটিয়া কোডতন্ত্রের ফল যা আমি'র গড়ন ঠিক করে দিচ্ছে।

তাই বিশ শতকের শেষভাগ থেকে আজকের একুশ শতকের প্রথমভাগ পর্যন্ত সময়কে স্বচ্ছন্দে গণমাধ্যমের বিশ্বায়নের সময় বলে অন্তত ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এই পর্যায়ে গণমাধ্যম বিশ্বব্যাপী বাণিজ্যিকতার যে চরম সীমায় পৌছল, ভারতবর্ষে তার মুখ্য আবাহন ঘটল প্রযোজিত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। মুখ্যত মেগা সোপ-অপেরা, এবং রিয়েলিটি শো'এর মধ্যে দিয়ে সার্বিকভাবে এক নতুন পরিসরে অতিরিক্ত এক সামাজিকতার উৎপাদন ঘটাতে শুরু করল। এই অতিরিক্ত সামাজিকতা নতুন দ্বন্দ্ব-সৃষ্টি তো করলই না, বরং এমন এক অতিরিক্ত মূল্যের সৃষ্টি করল যার প্রতিদানে মানুষ তার চিরন্তন এবং গড়ে তোলা আমি'র বিপরীতে আর এক আমি'কে দেখতে পেল যা কাছ থেকেও জীবনের নতুন মূল্য বিনা দ্বন্দ্বে পাওয়া যায়, বিনা শ্রমে উপলব্ধি করা যায়, এবং দৈনন্দিন একে পরিবর্তনও করা যায়। আমাদের জীবনের সাধারণ এমন কিছু ধর্ম বা অভ্যাস'কে এক সার্বিক বাণিজ্যিকতা ও ব্যায়ের (expendability) মোড়কে এবং মোহাবেশে (illusion) টেলিভিশনের পর্দায় পুনস্থাপন করল যা সহজেই আমি'কে সাধারণ সাংস্কৃতিক সৃষ্টি থেকে বিনোদন, বিনোদন থেকে পরিবার, এবং পরিবার থেকে সরাসরি রিয়েলিটি নামক মঞ্চে এনে ফেলল। প্রশ্নটা এখানে ভালো-খারাপের নয়, আমি'র নয়া নতুনত্বের ভবিষ্যতের এবং সর্বোপরি আমি'র নয়া প্রশিক্ষণের। এই নয়া আমি'র উত্তরণ বিনা দ্বন্দ্বে, সম্পূর্ণ এক নতুন উৎপাদন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সাধিত হলো। এই পর্যায়ে আমি, তুমি, আমরা পরিচিত হলো গণমাধ্যমের অসহায় অডিয়েন্স রূপে।

দ্বন্দ্ব-বর্জিত 'আমি'!

যে 'আমি' কান্ট, মার্কসের ভাবনা অনুযায়ী ব্যক্তি-সামাজিক বিরোধ এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছিল সেই 'আমি' আজ মুখ্যতই গণমাধ্যম বা প্রভাবশালী জ্ঞাপনের দ্বারা পরিমার্জিত, অনুমোদিত এবং সর্বোপরি সৃষ্ট। তাই একদিকে যেমন আমাদের তথাকথিত সামাজিকতারও পরিবর্তন ঘটল, তেমনি অন্যদিকে আমাদের ইচ্ছেডানার স্বাধীন ওড়ার ক্ষেত্রেও বড়সড় পটপরিবর্তন ঘটল। এই পরিবর্তন বা পরিমার্জন সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে যতটা না ঘটল তার চেয়ে অনেক বেশি ঘটল আমি'র পরিমার্জনে। এতকাল রবীন্দ্রনাথের 'মুক্ত' আমি, দৃপ্ত আমি'কে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে এক বিকল্প ব্যক্তি-সামাজিক পরিসরে বেড়ে উঠতে হতো। কিন্তু এখন ঠিক সেইখানে যাবতীয় প্রভাবশালী কোম্পানি-র মালিকানাধীন নতুন সামাজিক মোহ'কর পরিসর আমাদের উপহার দেওয়া হয়েছে ইচ্ছে মেলে ধরার জন্য। এই পর্যায়ে আমাদের আমি'র ইচ্ছেগুলো যে

Society Language and Culture

সামাজিক পরিসরে টিঁকে থাকার লড়াই করত সেই ইচ্ছেগুলিই আজ পরিণত হয়েছে আত্মপ্রকাশের মোহে। গণমাধ্যমের পাশাপাশি নতুন 'ভারচুয়াল' পরিসরে 'আমি'-কে মেলে ধরার ক্ষেত্রে আমাদের সব আমি-রা একদিকে যেমন পরিসরের প্রতিনিধিত্ব করে চলেছি, তেমনি মোহডানা-র বিস্তারও চলেছে দ্বিগুণ। এই বিস্তারের ফলে 'আমি'র সদাগতিময় সদাপরিবর্তনশীল সামাজিকতার পাশাপাশি সম্পূর্ণ পৃথক আর এক ভারচুয়াল মাধ্যমের 'আমি' প্রস্তুত করে চলেছে অবিরত। এখানে এই দুই পরিসর-কে একে অপরের সামাজিকতার প্রতিনিধি বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাও চলেছে অবিরত। এক আমি-র বাস্তবতা নবমাধ্যমে সেই আমি'রই মোহাবিষ্ট কোড-এ বা এক অযাচিত কিন্তু একচেটিয়া 'কথকতায়' এবং পরিচয়ে পর্যবসিত হচ্ছে।

এর ফলে ব্যক্তিস্তরে আমার দুই আমি'র বাস্তবতার প্রকাশ্য-গোপনীয়তার দ্বন্দ্ব বা ফারাক রয়েই যায়, আর সমষ্টিগত ক্ষেত্রে সেই ফারাক আরও অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়। এইভাবে আমি-র ভারচুয়াল সত্তার মোহাবেশের কোডের শক্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পেতে থাকে তার সামাজিকতার আমি'র জৈবনিক ভাষা বা সৃষ্টির কোড থেকে। এইভাবে এক 'আমি' অন্য এক মাধ্যমে আর এক আমি-র মধ্যে দিয়ে নতুনভাবে প্রকাশিত হতে হতে একসময় একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই অস্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা দিয়ে সামাজিক পরিসরে জ্ঞাপন শুধু তার ব্যাপকতা হারাচ্ছে তাই নয়, পারস্পরিক জ্ঞাপনের প্রয়োজনীয়তাও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে। যাবতীয় পারস্পরিক এবং গণ-জ্ঞাপন প্রক্রিয়া দারুণভাবে গণমাধ্যমের সম্প্রচারিত বিষয়কে অনুসরণ করে চলেছে।

ভারচুয়াল'এর 'আমি' বা 'আমি'র ভারচুয়াল

আবার নয়া-ভারচুয়াল পরিসরের মোহকর আমি'র কোড অনেক বেশি ঔজ্জ্বল্য নিয়ে প্রতিভাত হচ্ছে, যা দৈনন্দিন তুমি-তোমরা'কে এমনকি আমি'কেও স্বভাবতই অনেক পিছনে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু এই ভারচুয়াল 'আমি'ও তার এই ঔজ্জ্বল্যের কোড'কে চিরায়ত পরিণতি দিতে পারে না। আমার প্রোফাইল চিত্র এই পরিসরে আর্কাইভে থেকে গেলেও তার প্রতি আর পাঁচজনের আকর্ষণ এতই সীমাবদ্ধ যে নির্দিষ্ট কিছু দায়সারা লাইক এবং কমেন্ট এই নতুন আমি এবং তার সৃষ্টি-র নতুন ভাষাকে এমন স্থবির করে দিচ্ছে যে অদূর ভবিষ্যতেই তার আর কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। ফলে আর কোনো জ্ঞাপনও হয় না। বাড়ির দেওয়ালে টাঙানো পুরনো ছবির মতো অবস্থা হয়। তবে এই মাধ্যম-পরিসরটি কিন্তু বাড়ির দেওয়ালের মতো স্থবির নয়। কাজেই ব্যক্তি আমি-কে তার এই নতুন প্রোফাইল-কে যে কোনো উপায়ে চালু রাখার জন্য বাড়তি সক্রিয় হতে হয়। এই বাড়তি সক্রিয়তা সামাজিক গতিশীলতা থেকে অর্জন করার পরিশ্রম স্বভাবতই সে ততটা করে না। তাই এই নিষ্ক্রিয়তাকে বৈধতা দেওয়ার জন্য একদিকে যেমন ফেসবুকের লাইক, শেয়ার-এর অস্ত্র রয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সেলফি বা নিজস্বী দিয়ে আমি-কে সক্রিয় করে তোলার মধ্যে দিয়ে আমি-র কথকতা (story telling) চলতেই থাকে।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই সক্রিয়তা কি আমাদের সাধারণ সামাজিক সক্রিয়তারই অঙ্গ? অথবা যদি তা নাও হয়, আমরা সামাজিক ক্ষেত্রে কি এইরকমই সক্রিয় থাকি? এর উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের

Society Language and Culture

'কেন' অধ্যায়ে মনোনিবেশ করতে হবে, যেখানে আমাদের সক্রিয়তার মূল্যবিচার করে তবেই এর প্রকৃত বিচার হবে। তবে একথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করা যায় যে আমাদের এখন দুটি প্রত্যক্ষ আমি'কে সামলাতে কিঞ্চিৎ অতিসক্রিয়তার প্রয়োজন তো হচ্ছেই।

যাইহোক এইভাবে আমি এবং আমার নীতি-আদর্শের সামাজিক বিস্তার ভারচুয়াল পরিসরে সংখ্যায় ছড়িয়ে পড়ছে আর সামাজিক স্তরে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিসরগুলি সময়ের বিচারে ততই অব্যবহৃত হয়ে থেকে যাচ্ছে। আর এই বিচ্ছিন্নতার সুযোগে গণমাধ্যমের ক্ষমতার বিস্তার বহুগুণ বৃদ্ধি পাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের সেই মুক্ত আমি'র ইচ্ছেগুলো ক্ষমতার বৃত্তের বাইরে আছে। গণমাধ্যমের উপস্থিতিতেই বরং তার উন্নত এবং স্বতন্ত্র উপস্থিতি ততটা টের পাওয়া যায় না, অনুপস্থিতিতেই এরা ফুটে ওঠে, জঙ্গলে গোপনে ফুটে ওঠা বনফুলের মতো। আর ক্ষমতার উপস্থিতিতে তো এরা ফুটবেই না, কারণ ক্ষমতার কাজই তো অচেনা মানুষ নিয়ে, সে তো ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে কখনও মানুষকে চিনতে চায় না, বা তার দরকারও নেই। টেলিভিশন কতটা তার দর্শককে জানতে চায়, চিনতে চায়? এতটুকুও নয়।

তাই আমি'র এই বিচ্ছিন্নতা সামগ্রিকভাবে এক অদ্ভুত জটিলতার সূচনা করেছে। পরিস্থিতিটা এমনই যেখানে রিয়েলিটি বা বাস্তবতা আসলে গণমাধ্যম এবং সোশ্যাল-মাধ্যমের ইল্যুশন বা মোহাবেশে বিলীন হয়ে যাচ্ছে না বরং নয়া-মাধ্যমের মোহাবেশ আসলে আমাদের বাস্তবতার মধ্যে বিলীন হয়ে বস্তুভাবনাকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ফরাসী উত্তর-অবয়ববাদী জঁ বদ্রীলার[২০] অবশ্য এই বিচ্ছিন্নতাতেই থেমে থাকেন নি। তিনি ইউরোপ-আমেরিকার গণমাধ্যমের মোহাবেশ বা ইল্যুশনের ব্যাপ্তি দেখে বলেছিলেন 'এ যেন এক নিপুণতম অপরাধ (perfect crime) যেখানে সারা পৃথিবীতেই ভারচুয়াল মোহাবেশ আমাদের বাস্তবতা বা রিয়েলিটি'র সবটুকু ধ্বংস করে হত্যা করছে'। এইভাবে চলতে চলতে মানুষ নিজেই নিজের প্রকাশ সম্পর্কে এমন সব ধারণা তৈরি করবে যার কোনো জৈবনিক অস্তিত্ব নেই। ইল্যুশনের পর ইল্যুশন বা মোহাবিষ্টের উপরে নতুন মোহাবেশ এইভাবে চলতে থাকবে মানুষের জীবন। আমার 'আমি' তখন নিজেকেই খুঁজে বেড়াবে ভারচুয়ালের মধ্যে মোহাবেশের মধ্যে। আর পৃথিবীটার সম্পদের একচেটিয়া ভাগাভাগি হয়ে চলবে একেবারে সাম্রাজ্যবাদী ঢঙে, যা ইতিমধ্যেই এখন চলেছে। সম্পদের কেন্দ্রীভবনের একচেটিয়া প্রকাশ ঘটে চলেছে আর গণমাধ্যমের মধ্যে দিয়ে মানুষকে তার রিয়েলিটি'র অনুধাবনের পরিবর্তে আর এক রিয়েলিটি'র অনুষ্ঠানে নতুন নতুন আমি'র রূপকল্প উপহার দেওয়া হচ্ছে। শ্রম, সত্তা, আমরা, উৎপাদন, শোষণ, আন্দোলন, দাবি আদায়, অধিকার, সাধারণ মানুষ প্রভৃতি পরিচয়গুলো কেমন অনাবশ্যক হয়ে পড়েছে। এই নতুন আমি'কে চিরায়ত রাজনৈতিক, সামাজিক জ্ঞান দিয়ে পরিপুষ্ট করার ঐকান্তিক চেষ্টা হলেও তার মধ্যে সচেতন আমি'কে নতুন করে আবিষ্কার করা এককথায় কঠিন। আর এই কঠিনতার অঙ্কে দুই আমি'র বিচ্ছিন্নতাকে মেলানোর কিন্তু বেশ শক্ত কাজ।

Society Language and Culture

তবু সেই 'আমি' ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নয়, রাষ্ট্রের কল্যাণকর ঘোষণা বা মোড়কের নয়, সমাজের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠার নয়, লুম্পেন'এর বন্দুকবাধ্যও নয়, বরং আমার ও আমাদের স্বাধীন বাঁচার পরিচয়ের প্রতিনিধি, যা সমাজের কোনো বৈকল্যকে সিস্টেম বলে মানবে না বা চলতে বাধ্য হচ্ছি বলে চলবে না, আপন এবং আরও অনেক 'আমি'র ইচ্ছের সমষ্টি প্রস্তুত করতে সদা সক্রিয় থাকবে।

সূত্রনির্দেশঃ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ রক্তকরবী, ১৯২৬।
২। আবীর চট্টোপাধ্যায়ঃ মানবসত্ত্বার অভিপ্রায় – দ্বন্দ্বের নানামুখ; একুশ শতক, ২০১৮।
৩। তদেব।
৪। তদেব।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; প্রবন্ধ – আত্মপরিচয়।
৬। কার্ল মার্কসঃ কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো।
৭। ফ্রীডরিশ নীৎসেঃ অন ট্রুথ অ্যান্ড আনট্রুথ; হারপার পেরেনিয়াল।
৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ নাটক; রক্তকরবী।
৯। তদেব;
১০। তদেব;
১১। তদেব; নাটক; অচলায়তন।
১২। তদেব; প্রবন্ধ – আত্মপরিচয়।
১৩। তদেব; প্রবন্ধ – সঞ্চয়।
১৪। তদেব; গীতবিতান।
১৫। তদেব; প্রবন্ধ – পরিচয়।
১৬। তদেব।
১৭। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকঃ ক্যান দি সাব-অল্টার্ণ স্পিক; www.jstor.org।
১৮। তদেব।
১৯। তদেব।
২০। জঁ বদ্রীলারঃ পারফেক্ট ক্রাইম; ভারসো, ২০০৭।

Society Language and Culture